বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ
Natural Resources of Bangladesh

৪

ভূমিকা
Introduction

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদই প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ বিশ্বের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। কোথাও সম্পদের আধিক্য রয়েছে আবার কোথাওবা মারাত্মক অপ্রতুল। ফলে যেসব দেশ বা অঞ্চলে সম্পদের ঘাটতি রয়েছে সেখানে সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে খুব বেশি সমৃদ্ধ না হলেও এদেশে বেশ কিছু সম্পদ রয়েছে যা আহরণের অভাবে জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ভূমি সম্পদ, মানব সম্পদ প্রভৃতি। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সূচকসমূহ উন্নয়নে কাজ করে থাকে। খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন সিরামিক ক্লে, কাচ তৈরির সিলিকন, চুন তৈরির কাচাঁমাল সরবরাহ করে। মৎস্য সম্পদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে। ভূমি সম্পদ বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হয়। সামুদ্রিক সম্পদ একদিকে যেমন তেল ও গ্যাস সরবরাহ করে পাশাপাশি বহু ধরনের প্রাণি, জীববৈচিত্র্য ও নানাবিধ কোরাল উপাদানে ভরপুর। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের উন্নয়নে এবং অর্থনীতিতে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। কারণ এসব সম্পদ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী মানব সম্পদ হিসেবে কাজ করে। এদেশের জনসংখ্যার কাঠামো এবং বৃদ্ধির ধারা সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ কর্মক্ষম। কর্মক্ষম এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশেষ করে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। আর এজন্য দেশে যে সকল প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ রয়েছে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা
পাঠ-৪.২ : বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ
পাঠ-৪.৩ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ
পাঠ-৪.৪ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো ও বৃদ্ধির ধারা
পাঠ-৪.৫ : বাংলাদেশে সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব

মুখ্য শব্দ	কৃষি, কৃষি ব্যবস্থা, খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, শক্তি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, চুনাপাথর, সিলিকা বালু, কঠিন শিলা, চীনামাটি, নুড়িপাথর, জনসংখ্যা কাঠামো, বৃদ্ধির ধারা, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল, সম্পদ সংরক্ষণ।

পাঠ-৪.১ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা
Agricultural System in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদিত ফসলের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম জানতে পারবেন।

কৃষি
Agriculture

কৃষি হচ্ছে একটি সমন্বিত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যা পরিকল্পিতভাবে ভূমি বা পানিতে উদ্ভিদ ও প্রাণির ক্রমবিকাশ ঘটায় এবং খাদ্যসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। এটি মানুষের আদিমতম পেশার অন্যতম। কৃষি প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যা খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এছাড়া কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়নের অন্যতম মাধ্যম কৃষি। কৃষির বহুবিধ গুরুত্ব বিবেচনায় একে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের সার্বিক উন্নয়ন কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চলতি মূল্যে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ৯.৫৭% (বিবিএস, ২০২০)। কৃষি গণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা (Agriculural System in Bangladesh)

বাংলাদেশের কৃষির বিকাশে উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হলো অনুকূল জলবায়ু, বিস্তৃত উর্বর প্লাবন সমভূমি, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদা, সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি প্রভৃতি। ফলে কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রও বিস্তৃত। নিম্নের ছকে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রধান ক্ষেত্রগুলো দেখানো হলো-

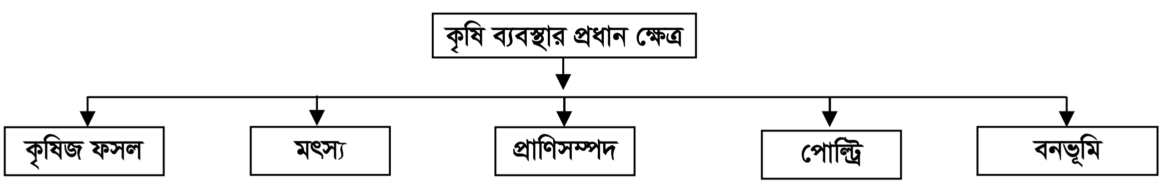

১. কৃষিজ ফসল (Agricultural Crops): বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রধান ক্ষেত্র নানা ধরনের কৃষিজ ফসল। সাধারণত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপযোগিতা পাওয়ার জন্য নানাবিধ ফসলের চাষাবাদ করা হয়। এদেশে উৎপাদিত কৃষিজ ফসলসমূহের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, পাট, ভুট্টা, সরিষা, ছোলা, ডাল, ইক্ষু ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল।

২. মৎস্য (Fisheries): প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মৎস্য। দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% আসে মৎস্য খাত থেকে। মাছ খেতে সুস্বাদু, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও অ্যামাইনো এসিডের উৎস। জলাশয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী মৎস্য সম্পদের উৎসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অভ্যন্তরীণ মিঠাপানি বা জলাশয়ের মাছ এবং সামুদ্রিক মাছ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছের মধ্যে রয়েছে রুই, কাতল, মৃগেল, শোল, বোয়াল, মাগুর, শিং, পুটি, পাবদা, কার্প জাতীয় মাছ এবং সামুদ্রিক মাছের মধ্যে রয়েছে রূপচান্দা, ভেটকি, লইট্যা, টুনা, ইলিশ, বাগদা চিংড়ি প্রভৃতি।

৩. প্রাণিসম্পদ (Livestock): বাংলাদেশের গ্রামবাংলা কৃষি নির্ভর হওয়ায় অধিকাংশ কৃষকই নানা ধরনের গবাদিপশু পালন করে। অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত স্বাবলম্বী হওয়ার অন্যতম উপায় হিসেবে গবাদিপশু পালন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাণিসম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি। এ সকল গবাদিপশু একদিকে যেমন প্রোটিন এর যোগান দেয় অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনে সরাসরি অবদান রাখে। এছাড়া উপজাত হিসেবে চামড়া, পশম, খুর, শিং ইত্যাদি পাওয়া যায় যা প্রক্রিয়াজাত করে শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে নানা ধরনের গবাদিপশু পালন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. পোল্ট্রি (Poultry): বাংলাদেশে কৃষির উপখাত পোল্ট্রি দ্রুত বর্ধনশীল। প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য ব্রয়লার মুরগীর খামার এবং ডিম উৎপাদনের জন্য লেয়ার খামার গড়ে উঠেছে। কৃষির পোল্ট্রি উপখাতের মধ্যে রয়েছে মুরগীর খামার, কবুতরের খামার, কোয়েলের খামার ইত্যাদি।

৫. বনভূমি (Forest): কৃষির একটি অন্যতম উপ-খাত হচ্ছে বনভূমি যা গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। বনজ সম্পদ থেকে প্রধানত ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, শিল্পের কাঁচামাল, ভেষজ দ্রব্যাদি, মধু প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট বনভূমির পরিমাণ ৬৩.৬৮ লক্ষ একর যা মোট আয়তনের ১৭.৪৬% (বিবিএস, ২০২০)।

কৃষিজ ফসলের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Agricultural Crops): বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলসমূহকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী ফসল।

১. খাদ্যশস্য (Food Grains): বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রধান ধান। অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বহু প্রজাতির ধানের চাষ হয়ে আসছে। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের ধান উৎপাদিত হয়। যথা-আউশ, আমন এবং বোরো। ধানের পরই রয়েছে গম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ভুট্টা, ডাল, আলু, সবজি, ফলমূল প্রভৃতি। সারণি ৪.১.১ এ বিগত কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাদ্যশস্যের উৎপাদন দেখানো হলো-

সারণি-৪.১.১: খাদ্যশস্যের উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
চাল	৩৩,৮০৪	৩৬,২৮০	৩৬,৩৯০
গম	১,৩১১	১,০৯৯	১,০১৭
ভুট্টা	৩,০২৬	৩,২৮৮	৩,২৪৫
ডাল	৩৯৩	৩৮৯	৩৮৭

উৎস: কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০২০

২. অর্থকরী ফসল (Cash Crops): অর্থকরী ফসল সাধারণত সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্যে চাষাবাদ করা হয়। অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-পাট, চা, ইক্ষু, তামাক, রেশম প্রভৃতি। সারণি ৪.১.২ এ বিগত কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অর্থকরী ফসলের উৎপাদন দেখানো হলো-

সারণি-৪.১.২: অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)

অর্থকরী ফসল	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
পাট	৮,২৪৭	৮,৮৯৫	৮,৫৭৬
চা	৮২	৭৮	৯১
ইক্ষু	৪,৪৪২	৭,৮২১	৩,৬৩১
তামাক	৯১	৮৯	৮২

উৎস: কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০২০

কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Technology in Agriculture): বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ হলেও পূর্বে প্রকৃতি নির্ভর সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে যা কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য ব্যবহারসমূহ হলো-জমি চাষে ট্রাক্টর বা

পাওয়ার টিলার, পানিসেচে ডিজেল ও বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্র, সেচ প্রকল্প, গভীর এবং অগভীর নলকূপ, বীজ বপনে ড্রাম সিডার, ফসল সংগ্রহের জন্য হারভেষ্ট মেশিন, ধান মাড়াইয়ের জন্য শ্যালো এবং হস্তচালিত মাড়াই মেশিন, যান্ত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা, পচনশীল পণ্য সংরক্ষণে হিমাগার, ধান ও চাল সংরক্ষণের জন্য খাদ্য গুদাম প্রভৃতি। এছাড়া সার ও কীটনাশক প্রয়োগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও স্প্রে মেশিন ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব (Importance of Agriculture in Bangladesh): কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একক বৃহত্তম খাত। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হওয়ায় কৃষিই অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, কর্মসংস্থান এবং বেশকিছু শিল্পের কাঁচামালও সরবরাহ করে থাকে কৃষি। এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক এবং টেকসই উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্বসমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ-

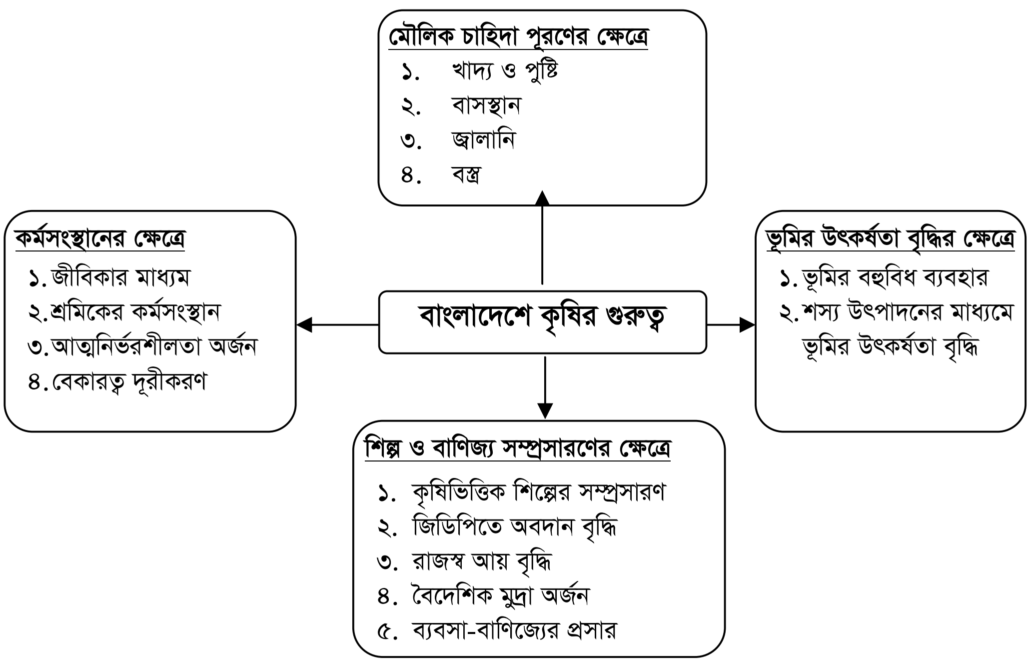

বাংলাদেশে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (Agriculture related Organization in Bangladesh): বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ হলো-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট,বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি তথ্য সেবা, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রভৃতি। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যম কৃষি বিষয়ক খবর ও তথ্য প্রচার করে থাকে। বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেও কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষি ব্যবস্থার সাথে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সম্পর্ক। সাধারণত কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য নিজেদের চাহিদা পূরণের পর তা বাজারে বিক্রি করা হয় যা অন্যদের চাহিদা পূরণ করে। এদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হলো কৃষিজ ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, পোল্ট্রি এবং বনভূমি। কৃষিজ ফসলসমূহকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী ফসল। খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, সবজি প্রভৃতি। অন্যদিকে, অর্থকরী ফসলের মধ্যে অন্যতম পাট, চা, ইক্ষু, তামাক, ফুল প্রভৃতি। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা খাদ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষির উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি কৃষির উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পাঠ-৪.২ বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ
Sources of Energy in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রধান শক্তি সম্পদসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

শক্তি সম্পদের ধারণা
Concept of Energy Source

যে সকল খনিজ পদার্থ প্রধানত শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে শক্তি সম্পদ বলে। শক্তি সম্পদ খনিজ সম্পদের একটি অংশবিশেষ। শিল্পকারখানা চালানো, যানবাহন, আলোকসজ্জা, জ্বালানি প্রভৃতি কাজে শক্তি সম্পদ ব্যবহার করা হয়। শক্তি সম্পদ অনবায়নযোগ্য ও নবায়নযোগ্য উভয় প্রকার হতে পারে। তবে শক্তির প্রধান উৎসগুলো অনবায়নযোগ্য যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা প্রভৃতি। নবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তি, পানিবিদ্যুৎ প্রভৃতি।

বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ (Energy Sources of Bangladesh)

বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে শক্তি সম্পদের উৎসের পরিমাণ সীমিত। ফলে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর শক্তির বহুবিধ চাহিদা পূরণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ শক্তি আমদানি করতে হয় যা নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- নানা ধরনের পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট যার মধ্যে রয়েছে অপরিশোধিত তেল, গ্যাস, ঘনীভূত গ্যাস, কয়লা, সৌর প্যানেল, পারমাণবিক শক্তি, গ্রীড ইলেকট্রিসিটি, বায়োগ্যাস, এলপিজি ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের উল্লেখযোগ্য উৎসগুলো আলোচনা করা হলো:-

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

প্রাকৃতিক গ্যাস এক প্রকার উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন যাতে রয়েছে প্রোপেন, ইথেন, বুটেন, মিথেন ও অন্যান্য কতিপয় গ্যাস। এটি বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭১ ভাগ পূরণ করে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে (সারণি ৪.২.১)। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী, মোট প্রাথমিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৯.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭.৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২০)। বাংলাদেশের প্রাপ্ত গ্যাস অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের কারণ এতে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৯৪-৯৯% হওয়ায় পরিশোধন ছাড়াই এই গ্যাস ব্যবহার করা যায়।

সারণি-৪.২.১: বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ

উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনে যায় নাই	উৎপাদন স্থগিত
তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, হরিপুর, মেঘনা, নরসিংদী, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, সালদা, শাহবাজপুর, সেমুতাং, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, বাঙ্গুরা।	কুতুবদিয়া, ভোলা নর্থ	রূপগঞ্জ, ছাতক, কামতা, ফেনী, সাঙ্গু

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২০

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্র বর্ণনা করা হলো-

তিতাস গ্যাসক্ষেত্র: বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র তিতাস। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নামক স্থানে ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ২৬টি। এখানে গ্যাসের প্রাথমিক মোট মজুদ ৮,১৪৮.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ ৬,৫১৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এই খনি হতে প্রাপ্ত গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৬.২৭%। তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে উত্তোলিত গ্যাস আশুগঞ্জ সার কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল সার কারখানা

ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও পাইপলাইনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী শিল্প ও আবাসিক এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র: ১৯৫৫ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রটি সিলেটের হরিপুরের ফতেহপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। এখানে প্রাথমিক মোট মজুদের পরিমাণ ৩৭০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ ৩৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এই গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৯.০৫%। এখান থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র: ১৯৬২ সালে সিলেটের গোপালপুর গ্রামের নিকট কৈলাশটিলাতে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এ গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ৪টি। কৈলাশটিলায় প্রাথমিক মোট মজুদ প্রায় ৩,৬১০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ ২,৭৬০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এখানে প্রাপ্ত গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৫.৭০%। এই গ্যাসক্ষেত্র হতে উত্তোলিত গ্যাস সিলেট শহরে সরবরাহ করা হয়।

হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র: ১৯৬৩ সালে হবিগঞ্জ জেলায় এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করা হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ৮টি। এখানে সঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ ৩,৬৮৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ ৩,০৯৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এখানে প্রাপ্ত গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৭.৮%। হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র হতে শাহজীবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র: কুমিল্লা জেলার বাখরাবাদ নামক স্থানে এ গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত। এটি ১৯৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। এখানে উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ৭টি। এ গ্যাসক্ষেত্রে প্রাথমিক মোট মজুদ প্রায় ১,৭০১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ ১,৩৩৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এই গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৩.৮৯%। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র হতে চট্টগ্রাম শহর এবং কুমিল্লা ও ফেনীতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র: রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রটি ১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত হয়। এটি হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এ গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ৫টি। এখানে প্রাথমিক মোট মজুদের পরিমাণ ৩,৬৫০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ ৩,১১৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

খনিজ তেল (Petroleum)

শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস খনিজ তেল। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর সিলেট জেলার হরিপুরের ফতেহপুর ইউনিয়নে হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। বর্তমানে হরিপুর তেলক্ষেত্র হতে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হচ্ছে। উত্তোলিত অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়। পরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। এছাড়া ১৯৮৭ সালে মৌলভীবাজারের বরমচালে দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকে দৈনিক ১,২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়। হরিপুর ও বরমচাল তেল খনি ছাড়াও সিলেট জেলার কৈলাশটিলা ও হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে অতি অল্প পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। এছাড়া বরিশাল জেলার হিজলা, মুলাদি, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, নাটোর জেলার নিমগাঁ, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং বগুড়ায় তেল প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

কয়লা (Coal)

শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। বর্তমানে দেশে প্রধান পাঁচটি কয়লা খনি রয়েছে। এসব কয়লা খনি থেকে প্রধানত তিন ধরনের কয়লা পাওয়া যায়। যথা-বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট। বিটুমিনাস ও লিগনাইট শ্রেণির কয়লায় ছাই ও গন্ধকের পরিমাণ বেশি এবং কার্বনের পরিমাণ খুবই কম। পীট কয়লার উদ্ভব হয় উদ্ভিদ হতে কয়লায় পরিণত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো-

জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র: জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে এ কয়লাক্ষেত্র অবস্থিত। এটি ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। এই কয়লাক্ষেত্রটির বিস্তৃতি ১১.৬৬ বর্গকিলোমিটার এবং কয়লা স্তরের গভীরতা ৬৪০ থেকে ১,১৫৮ মিটার। এখানে মজুদ কয়লার পরিমাণ প্রায় ১০৫ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বড় পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র: দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়ায় এ কয়লাক্ষেত্রটি অবস্থিত। এটি ১৯৮৫ সালে আবিষ্কৃত হয়। এর বিস্তৃতি ৫.২৫ বর্গকিলোমিটার যা ছয়টি স্তরে বিভক্ত এবং গভীরতা ১১৭-৫০৬ মিটার। এই খনি থেকে দৈনিক প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন হয়। এখানে উত্তোলিত কয়লার অধিকাংশই বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। এই খনিতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন।

খালাসপীর কয়লাক্ষেত্র: রংপুর জেলায় খালাসপীর কয়লাক্ষেত্রের অবস্থান। এটি ১৯৮৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। এর আয়তন প্রায় ১২.৫৬ বর্গকিলোমিটার এবং কয়লা স্তরের গভীরতা ২৯৭ হতে ৪৮২ মিটার। এই খনিতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র: দিনাজপুর জেলার দিঘীপাড়ায় এ কয়লাক্ষেত্রটি ১৯৯৫ সালে আবিষ্কৃত হয়। এ কয়লাক্ষেত্রে কয়লা স্তরের গভীরতা ভূ-গর্ভে ৩২৮ হতে ৪৫৫ মিটার। দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের কয়লা স্তরের সংখ্যা ৭টি। এ কয়লাক্ষেত্রের স্তরসমূহের গড় পুরুত্ব ৬১ মিটার। এখানকার কয়লা উৎকৃষ্ট মানের।

ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র: ১৯৯৭ সালে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী নামক স্থানে এ কয়লাক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফুলবাড়ীতে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা পাওয়া যায়।

উল্লিখিত প্রধান পাঁচটি কয়লাক্ষেত্র ছাড়াও বগুড়া জেলার নন্দীগ্রামের কুচমা, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জেও কয়লা পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলা, ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলাবিল, সুনামগঞ্জের দিরাই ও সাল্লা, বাগেরহাট জেলার কোলামৌজা এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস এবং লিগনাইট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি (Electric Power)

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৮,৯৬১ মেগাওয়াট এবং উৎপাদন করা হয় ১২,৮৯২ মেগাওয়াট (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯)। দেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তিকে উৎসের উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- তাপ বিদ্যুৎ, পানি বিদ্যুৎ এবং সৌরবিদ্যুৎ।

ক. তাপ বিদ্যুৎ (Thermal Electricity): তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা, গ্যাস, খনিজ তেল প্রভৃতি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় যা শক্তির অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো হলো- নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ, খুলনা জেলার গোয়ালপাড়া, নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল, হবিগঞ্জ জেলার শাহজীবাজার, ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম এবং কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

খ. পানি বিদ্যুৎ (Hydro Electricity): বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। এই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধের দৈর্ঘ্য ৬৪৫ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৪০ মিটার। প্রাথমিক পর্যায়ে এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৮০ মেগাওয়াট। বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৩০ মেগাওয়াট। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, খুলনা প্রভৃতি শহরেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

গ. সৌরবিদ্যুৎ (Solar Electricity): বাংলাদেশে বর্তমানে শক্তির একটি বিকল্প উৎস সৌরবিদ্যুৎ। দেশের বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ময়মনসিংহের সুতিয়াখালীতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ মেগাওয়াট। এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ময়মনসিংহ শহরের কেওয়াটখালী জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। এই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ছাড়াও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এবং বাসাবাড়িতে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাহিদা মেটানো হয়। বর্তমানে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উদ্ভিদ থেকে জ্বালানি (Fuel from Wood): বাংলাদেশে শক্তির আরেকটি উৎস উদ্ভিদ থেকে জ্বালানি। এদেশের অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উদ্ভিদের কাঠ দৈনন্দিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য উদ্ভিদকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের সবচেয়ে নেতিবাচক দিক হলো বনাঞ্চলের উপর প্রভাব।

সারসংক্ষেপ

শক্তি সম্পদ খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তোলিত শক্তি সম্পদ প্রধানত নানা ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গৃহস্থালি চাহিদা মেটাতেও বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করা হয়। শক্তি সম্পদ দুই প্রকার হতে পারে। যথা- নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য। নবায়নযোগ্য শক্তি একবার ব্যবহার করলেও তা প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অনবায়নযোগ্য শক্তি একবার ব্যবহার করলে তা আর ব্যবহার করা যায় না। শক্তি সম্পদ হিসেবে যে সকল খনিজ ব্যবহার করা হয় তার বেশিরভাগই অনবায়নযোগ্য। ফলে শক্তির যে উৎসগুলো রয়েছে তার সঠিক ও পরিমিত ব্যবহার প্রয়োজন। বাংলাদেশে যেসব উৎস ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা। এছাড়া পানি বিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। দেশে এ পর্যন্ত ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র, ২টি তেলখনি এবং ৫টি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। রাঙামাটি জেলার কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় একটি বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তবে এসব শক্তি দেশের চাহিদা পূরণ না করায় শক্তির নানাবিধ কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। বিশেষ করে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল, কয়লা ও এলপিজি গ্যাস আমদানি করা হয়। বর্তমানে শক্তির ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণের জন্য সরকার নবায়নযোগ্য শক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

পাঠ-৪.৩ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ
Mineral Resources of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খনিজ সম্পদ বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ বর্ণনা করতে পারবেন।

খনিজ সম্পদের ধারণা
Concept of Mineral Resources

প্রকৃতির নিয়মে এক বা একাধিক উপাদানে গঠিত বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো খনিজ দ্রব্য। সাধারণত বিভিন্ন শিলার উপাদানগুলো ভূ-তাত্ত্বিক সময়ের উপর নির্ভর করে ক্রমান্বয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে রয়েছে গ্যাস, তেল, কয়লা, আকরিক লৌহ, এ্যালুমিনিয়াম, ট্যাংস্টেন, সোনা, হিরা, রুপা, চুনাপাথর, তামা, কঠিন শিলা প্রভৃতি।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ (Mineral Resources of Bangladesh)

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হলেও বেশ কিছু খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিকা বালু, কঠিন শিলা, চীনামাটি, নুড়িপাথর, ইউরেনিয়াম আকরিক, গন্ধক প্রভৃতি। এসব খনিজ সম্পদ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় (চিত্র ৪.৩.১)। নিম্নে দেশে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ আলোচনা করা হলো:-

প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল (Natural Gas and Petroleum): বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল। প্রাকৃতিক গ্যাস মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭১ ভাগ চাহিদা পূরণ করে। দেশে এ পর্যন্ত ২৭টি গ্যাসক্ষেত্র এবং ২টি তেল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেশে প্রথম গ্যাসের খনি পাওয়া যায় ১৯৫৫ সালে এবং তেলের খনি পাওয়া যায় ১৯৮৬ সালে (পাঠ ৪.২-এ এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

কয়লা (Coal): বাংলাদেশে প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট জাতীয় কয়লা পাওয়া গেছে। দেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত কয়লা খনিগুলোর মধ্যে বড়পুকুরিয়া বৃহত্তম। বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিটুমিনাস ও লিগনাইট উৎকৃষ্ট মানের কয়লা এবং পিট জাতীয় কয়লা নিম্নমানের (পাঠ ৪.২-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

চুনাপাথর (Limestone): বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ চুনাপাথর। সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট, লালঘাট ও বাগলিবাজার, সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ, চরগাঁ ও ভাঙ্গারহাট, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ, কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় চুনাপাথর পাওয়া যায়। সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গৃহনির্মাণ, গ্লাস, ইস্পাত, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার, রং ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রভৃতি তৈরিতে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

সিলিকা বালু বা কাঁচ বালু (Silica Sand): কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বাতাসিয়া, শেরপুর জেলার গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী বালিজুরি, হবিগঞ্জের শাহজীবাজার ও নয়াপাড়া এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানায় কয়লার উপরিভাগে সিলিকা বালু পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া ও সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট অঞ্চলে প্রচুর সিলিকা বালু পাওয়া যায়। সিলিকা বালু সাধারণত সূক্ষ্ম থেকে মাঝারি আকৃতির কোয়ার্টজ, যা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। এটি প্রধানত কাঁচ প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রং, অগ্নিচুল্লি এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু ব্যবহৃত হয়।

কঠিন শিলা বা পাথর (Hard Rock or Stone): ১৯৬৬ সালে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার রানীপুকুর নামক স্থানে প্রায় ১৮২ মিটার মাটির নিচে প্রথম কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার মধ্যপাড়ায় ১২১ মিটার মাটির নিচে কঠিন শিলা রয়েছে যা ২০০৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়। মধ্যপাড়ায় গ্রানোডায়োরাইট, কোয়ার্টজ, ডায়োরাইট, নিস্ ইত্যাদি কঠিন শিলা পাওয়া যায়। এছাড়া নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ এবং পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ায় কঠিন শিলা পাওয়া গেছে। রেললাইন, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, নদীর বাঁধসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। দেশে কঠিন শিলার মোট মজুদের পরিমাণ ১৭১ মিলিয়ন মেট্রিক টন যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য ১০১ মিলিয়ন মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০২০)।

চিত্র: ৪.৩.১: বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ

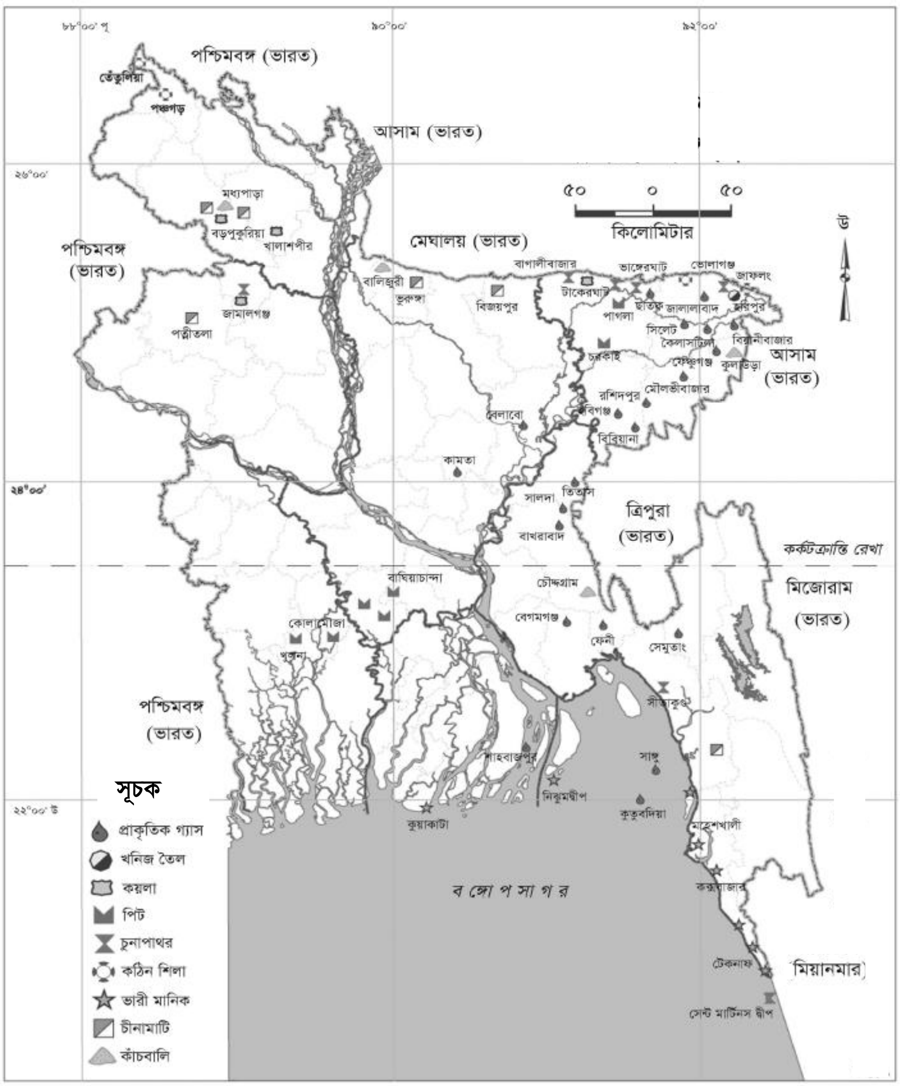

চীনামাটি (China Clay): দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া, নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার ভুরুংগা, চট্টগ্রাম জেলার হাইটগাও, কাঞ্চপুর ও এলাহাবাদ এবং নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় চীনামটি পাওয়া গেছে। চীনামাটি প্রধানত তৈজসপত্র, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর, স্যানিটারি জিনিসপত্র, বাসনপত্র, কাগজ প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

নুড়িপাথর (Gravel): পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় ও তেঁতুলিয়া, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম এবং সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ ও পিরানগঞ্জে নুড়িপাথর পাওয়া যায়। নুড়িপাথর রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, রেলপথ ও গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ইউরেনিয়াম আকরিক (Uranium Ore): কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া হতে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে ইউরেনিয়াম আকরিক পাওয়া যায়। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার হাড়গাছা পাহাড়ে ইউরেনিয়াম আকরিক পাওয়া গেছে। এটি প্রধানত পারমাণবিক চুল্লিতে শক্তি ও পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইউরেনিয়াম আকরিক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পিট (Peat): দেশের উত্তর-পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জলাভূমিতে পিটের মজুদ রয়েছে। এদেশে প্রাপ্ত পিটের তাপোৎপাদন মান পাউন্ড প্রতি ৬,০০০-৭,০০০ বিটি ইউ।

গন্ধক (Sulphur): কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে। সাধারণত দিয়াশলাইয়ের বারুদ, সালফিউরিক এসিড, আতশবাজি, বিস্ফোরক, কীটনাশক প্রভৃতি তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়।

সৈকত বালি (Sea Sand): বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা বিশেষ করে উপকূলীয় বলয় ও দ্বীপসমূহে সৈকত বালি রয়েছে। সৈকত বালিতে বিভিন্ন ধরনের ভারী মানিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-জিরকন, রুটাইল, কায়ানাইট ও ইলমেনাইট।

তামা (Copper): তামা একটি অধাতব খনিজ। তামার তৈজসপত্র এক সময় বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি বড় ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন প্রকার তৈজসপত্র, বৈদ্যুতিক তার, স্ক্রু-নাট, ডেকোরেশন সরঞ্জামসহ বিভিন্ন কাজে তামা ব্যবহার করা হয়। দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জে আগ্নেয় শিলার সাথে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক উপায়ে এক বা একাধিক উপাদানে গঠিত হয়ে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিকা বালু, কঠিন শিলা, চীনামাটি, নুড়িপাথর, ইউরেনিয়াম আকরিক, গন্ধক উল্লেখযোগ্য। এসকল খনিজ সম্পদ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হয়। যদিও এদেশে উত্তোলিত খনিজ সম্পদের পরিমাণ একেবারে সীমিত তথাপি এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বাংলাদেশে লুকায়িত খনিজ সম্পদের যথাযথ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। খনিজ সম্পদ বাণিজ্যিক উত্তোলনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাই সীমিত এই খনিজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সকলকে সচেতন হতে হবে।

পাঠ-৪.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো ও বৃদ্ধির ধারা
Population Structure and Growth Trend in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা
Population

ভৌগোলিক অর্থে জনসংখ্যা বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বা অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার কাঠামো এবং প্রবৃদ্ধির হারে ভিন্নতা দেখা যায়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জনসংখ্যার কাঠামো এবং প্রবৃদ্ধির হার পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন কখনো ধীরগতিতে আবার কখনো দ্রুত গতিতে হয়েছে। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা তারতম্য প্রতীয়মান হয়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি, কাম্যিক জনসংখ্যা, জনসংখ্যার নির্ধারক এবং জনমিতিক পরিবর্তনের ও প্রভাবের বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা জানার উপায় হলো জনসংখ্যা গণনা যা আদমশুমারী বা Population Census নামে অভিহিত। বিশ্বে আধুনিক আদমশুমারী চালু হয় সপ্তদশ শতকে। বর্তমানে ৫ বা ১০ বছর ব্যবধানে জাতীয়ভাবে জনসংখ্যা গণনা করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত প্রতি ১০ বছর পরপর আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা কাঠামো (Population Structure in Bangladesh)

কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য জনসংখ্যার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সেখানকার জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দেশ বা অঞ্চলভেদে জনসংখ্যার কাঠামোগত পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়। জনসংখ্যা কাঠামোর মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ-বয়স, পুরুষ-মহিলা অনুপাত, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, জনসংখ্যার গ্রাম-শহর বন্টন, পেশাগত বন্টন প্রভৃতি।

লিঙ্গ-বয়স কাঠামো (Sex-Age Structure): মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বয়স। প্রজনন ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা, রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তি, মতামত প্রদান প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে মানুষের বয়সগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স-লিঙ্গভিত্তিক কাঠামো সারণি ৪.৪.১ এ দেখানো হলো।

সারণি-৪.৪.১: বাংলাদেশের জনসংখ্যার লিঙ্গ-বয়সভিত্তিক কাঠামো

বয়স শ্রেণি (বছর)	পুরুষ (লক্ষ)	নারী (লক্ষ)
০-১৪	২৫৫.৭৪	২৪৩.০৪
১৫-৪৯	৩৫৯.৩	৩৮৪.০৩
৫০-৭৪	৯৩.১১	৮০.১৬
৭৫+	১২.৮৭	১২.০২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০১৯

জীবন প্রত্যাশা (Life Expectency): জনসংখ্যা কাঠামোতে জীবন প্রত্যাশা একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক। চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানের প্রত্যাশিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে এদেশের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৭২ বছর। এর মধ্যে পুরুষ ৭০.৫ বছর এবং মহিলা ৭৩.৫ বছর। যা ১৯৭৪ সালে ছিল ৪৬.২ বছর, এর মধ্যে পুরুষ ৪৫.৩ বছর এবং মহিলা ৪৬.৬ বছর (বিবিএস, ২০২০)।

জনসংখ্যার পেশাগত বন্টন (Occupational Distribution of Population): বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করায় কৃষিখাতে সম্পৃক্ত জনসংখ্যা অধিক। তবে সময়ের সাথে সাথে অকৃষিখাত যেমন-চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা, সেবামূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিশুমারী-২০১৯ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের মোট খানার ৪৬.৬১ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশের পেশা কৃষি এবং ৫৯.৪ শতাংশ অকৃষি। অথচ ১৯৬১ সালে মোট জনসংখ্যার ৮৬ শতাংশের পেশা ছিল কৃষি এবং ১৪ শতাংশ অকৃষি (বিবিএস, ২০২০)।

পুরুষ-মহিলা অনুপাত (Male-Female Ratio): বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পুরুষ ও নারী অনুপাত। সারণি ৪.৪.২-এ প্রদর্শিত তথ্যানুসারে পুরুষ-মহিলার অনুপাতে খুব বেশি পার্থক্য প্রতীয়মান হয় না। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি-৪.৪.২: বাংলাদেশের জনসংখ্যার পুরুষ-মহিলা অনুপাত

সাল	পুরুষ-মহিলা অনুপাত	সাল	পুরুষ- মহিলা অনুপাত
১৯১১	১০৪.৫	১৯৭৪	১০৭.৭
১৯২১	১০৫.৫	১৯৮১	১০৬.৪
১৯৩১	১০৫.৯	১৯৯১	১০৬.১
১৯৪১	১০৭.৫	২০০১	১০৬.৪
১৯৫১	১০৯.৭	২০১১	১০০.৩
১৯৬১	১০৭.৬	২০১৮	১০২.০

উৎস: বিবিএস, ২০২০

জনসংখ্যার গ্রাম ও শহর বন্টন (Rural-Urban Distribution of Population): জনসংখ্যার গ্রাম ও শহরভিত্তিক বন্টন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি নির্দেশ করে। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী গ্রামে বসবাস করলে সাধারণত কৃষি নির্ভর অর্থনীতি হয়ে থাকে। এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করায় এখানকার অর্থনীতিও মূলত কৃষিভিত্তিক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়ণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫০ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৮৫% এবং শহুরে ৩.৮৬%। ২০১১ সালে এসে গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ১.৩১% এবং শহুরে ৩.৪৮%। বর্তমানে ৩৫% জনগোষ্ঠী শহরে বসবাস করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা (Population Growth Trend in Bangladesh)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যার সংখ্যাত্মক বা আকারগত পরিবর্তনকে বোঝায়। জনসংখ্যার সংখ্যাত্মক পরিবর্তনের প্রবণতার সাথে কোনো দেশ বা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক সূচকগুলো সম্পর্কযুক্ত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনাপূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে তা টেকসই হয়ে থাকে।

বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে এদেশ বিশ্বে ৮ম। ঐতিহাসিককাল থেকেই এদেশের জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে যার ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। তবে এ পরিবর্তনের ধারা সব সময় একই রকম থাকেনি। দেশে ১৯১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ০.৯৪ ভাগ এবং ১৯৫১ সালে কমে শতকরা ০.৫০ ভাগে দাঁড়ায়। আবার ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়ে শতকরা ২.২৬ ভাগে দাঁড়ায় এবং ২০১৮ সালে কমে শতকরা ১.৩৭ ভাগে নেমে আসে। ১৯১১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ৩১.৬ মিলিয়ন যা ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৩.৭ মিলিয়নে পৌঁছেছে

সারণি-৪.৪.৩: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা, ঘনত্ব এবং বৃদ্ধির হার

সাল	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	ঘনত্ব (ব.কি.মি)	বৃদ্ধির হার(%)
১৯১১	৩১.৬	২১৪	০.৯৪
১৯২১	৩৩.২	২২৫	০.৬০
১৯৩১	৩৫.৬	২৪১	০.৭৪
১৯৪১	৪২.০	২৮৫	১.৭০
১৯৫১	৪৪.২	২৯৯	০.৫০
১৯৬১	৫৫.২	৩৭৪	২.২৬
১৯৭৪	৭৬.৪	৫১৮	২.৪৮
১৯৮১	৮৯.৯	৬০৯	২.৩৫
১৯৯১	১১১.৫	৭৫৫	২.১৭
২০০১	১৩০.৫	৮৮৪	১.৪৮
২০১১	১৪৯.৯	৯৭৬	১.৩৭
২০১৮ *	১৬৩.৭	১,১০৩	১.৩৭

*প্রাক্কলিত উৎস : বিবিএস-২০২০

(সারণি ৪.৪.৩)। **১৯১১** থেকে **২০১১** সালের আদমশুমারী পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে **৩৫৬** শতাংশ।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা থেকে ভবিষ্যতে জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সারণি-৪.৪.৪ এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি, বৃদ্ধির হার ও দ্বিগুণ হওয়ার সময় উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৪.৪.৪: জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি, বৃদ্ধি হার ও দ্বিগুণ হওয়ার সময়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি	বাৎসরিক বৃদ্ধির শতকরা হার	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময়
স্থিতিশীল জনসংখ্যা	কোনো বৃদ্ধি নেই	-
ধীর বৃদ্ধি	০.৫ এর কম	১৩৯ বৎসরের বেশি সময়
মধ্যম বৃদ্ধি	০.৫-১.০	১৩৯-৭০ বৎসর
দ্রুত বৃদ্ধি	১.০-১.৫	৭০-৪৭ বৎসর
অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি	১.৫-২.০	৪৭-৩৫ বৎসর
বিস্ফোরণমূলক বৃদ্ধি	২.০-২.৫	৩৫-২৮ বৎসর

উৎস : তাহা (১৯৮৯), জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল

২০১৮ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল **১.৩৭%**। এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে সারণি-৪.৪.৪ অনুযায়ী আগামী ৭০-৪৭ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা করা যেতে পারে। তবে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সাফল্যও অর্জন করছে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো কমে আসবে বলে আশা করা যায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রচারণা ও কার্যক্রমের ফলে জনসচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ (Reaping the prospect of Demographic Dividend in Bangladesh)

জনসংখ্যা কাঠামোর পরিবর্তন বাংলাদেশে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাসের মাধ্যমে সাময়িক 'বেবী বুম' (Baby Boom) অতিক্রম করে কর্মক্ষম যুব জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। জন্ম ও মৃত্যু হার ব্যাপক হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা কাঠামোতে নির্ভরশীল জনসংখ্যা কমিয়ে কর্মক্ষম যুব জনসংখ্যা সৃষ্টি করছে। এক সময়ের নির্ভরশীল যুব জনসংখ্যা এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কারণে উৎপাদনক্ষম ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে শ্রমশক্তি সরবররাহ, সঞ্চয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে। কাজেই এই মুহূর্তে নীতিনির্ধারকদের দরকার দ্রুত ১৫ থেকে ৫৯ বৎসরের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশকে টেকসই উপায়ে অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করার বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ। সাধারণত: ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সময়কাল হয় ১০ থেকে ২০ বৎসর। বাংলাদেশের সামনে আরো এক দশক সময় রয়েছে এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাতে যুব জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়।

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল ও বাংলাদেশ (Demographic Transition Model and Bangladesh)

১৯২৯ সালে মার্কিন ভূগোলবিদ ওয়ারেন থম্পসন (Warren Thompson) জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল বা জনসংখ্যা পরিবৃত্ত মডেলটি উপস্থাপন করেন। মডেলটি জনসংখ্যা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারায় যে পরিবর্তন হয় তাই এ মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ওয়ারেন এই মডেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তন ধারার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জনসংখ্যার অবস্থানগত পরিবর্তন, বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তন ধারার উপর ভিত্তি করে এ মডেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জন্মহার উচ্চ থাকে, তবে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। তৃতীয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী হয়। চতুর্থ পর্যায়ে মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যার যে হ্রাস ঘটে, জন্মের ফলে তা পূরণ নাও হতে পারে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী।

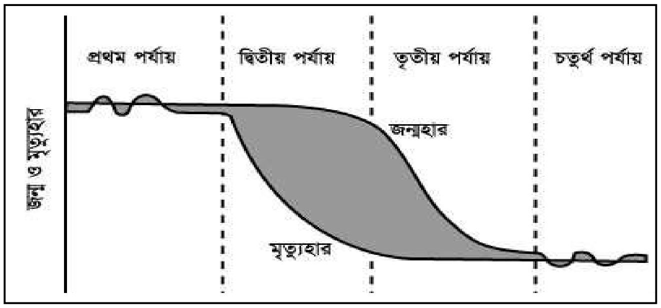

চিত্র ৪.৪.১ : জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলোকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশ জনসংখ্যা উত্তরণের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সারণি ৪.৪.৩ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, **১৯১১** সাল থেকে **১৯৫১** সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ছিল প্রথম পর্যায়ের। এ সময় জন্ম ও মৃত্যুহার উচ্চ ছিল বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল। **১৯৫১** সালের পর থেকে **১৯৯১** সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থাকায় মোট জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। **১৯৫১** সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪.২ মিলিয়ন যা **১৯৯১** সালে দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে **১১১.৫** মিলিয়ন। **১৯৬০** থেকে **১৯৯০** এর দশকে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। এসময় মৃত্যুহার হ্রাস পেতে থাকলেও সে তুলনায় জন্মহার হ্রাস পায়নি। ফলে এ সময়ে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার **১৯৯১** সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে যা ২০১৮ সালে ১.৩৭% এ দাঁড়ায়। এ সময় জন্ম ও মৃত্যুহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশ জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ প্রান্তে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ দ্রুত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করছে। মানুষের মধ্যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং গড় আয়ুষ্কাল বেড়েছে। এতে জন্ম ও মৃত্যুহার নিম্নমুখী হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে অষ্টম স্থানের অধিকারী। এদেশের জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জনসংখ্যার কাঠামোগত এবং বৃদ্ধির ধারায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। **১৯১১** সালে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১.৬ মিলিয়ন যা ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৪৯.৭ মিলিয়ন এবং ২০১৮ সালে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৬৩.৭ মিলিয়ন। একইভাবে জনসংখ্যার সংখ্যাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃদ্ধির হারেও পার্থক্য দেখা যায়। **১৯১১** সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৯৪ শতাংশ যা ১৯৭৪ সালে পৌঁছায় ২.৪৮ শতাংশে এবং ২০১৮ সালে প্রাক্কলিত হার ১.৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে জনসংখ্যার কাঠামোগত দিক থেকেও পরিবর্তন দেখা যায়। জনসংখ্যার নারী-পুরুষ, লিঙ্গ-বয়স, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, পেশাগত বন্টনে পরিবর্তন হয়েছে। জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা উক্ত মডেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ প্রান্তে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারবে যা দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে এবং ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বে রূপান্তর হতে সাহায্য করবে।

পাঠ-৪.৫ বাংলাদেশে সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব
Importance of Resource Conservation in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পদ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

সম্পদের ধারণা
Concept of Resources

সাধারণত যেসব দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে, ক্রয়-বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ যার আর্থিক মূল্য আছে সেগুলোকে সম্পদ বলে। যেসব দ্রব্য মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে তার যোগান তুলনামূলক সীমাবদ্ধ। ফলে মানুষের সীমাহীন চাহিদা মেটাতে সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং সংরক্ষণ জরুরি।

সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Resource Conservation)

বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি, তবে জনসংখ্যা বেশি হলেও সম্পদের পরিমাণ সীমিত। ফলে সীমিত সম্পদ দিয়ে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করতে হয়। এদেশে প্রকৃতিগতভাবে যেসব সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ভূমি সম্পদ প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী যা দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে মানব সম্পদে পরিণত হতে পারবে।

খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Resource Conservation): খনিজ সম্পদ হলো গচ্ছিত সম্পদ যা একবার ব্যবহার করলে তা আর নবায়ন করা যায় না। এজন্য খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হয়। এছাড়া যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। খনিজ সম্পদ বিশ্বের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী। অথচ বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ সম্পদ মজুদ থাকলেও এর উত্তোলন ও সঠিক বিতরণ ব্যবস্থাপনার অভাব। কাজেই এই মজুদ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। তাপ ও আলোক শক্তি উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। শিল্পকারখানার জ্বালানি, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার, কৃষির উন্নতি, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস, কর্মসংস্থান, সরকারি আয়ের উৎস প্রভৃতি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় সেগুলো সংরক্ষণ জরুরি।

বনজ সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Forest Resource Conservation): জাতীয় জীবনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক হলেও বাংলাদেশে রয়েছে শতকরা ১৭.৪৬ ভাগ। এই অপর্যাপ্ত বনভূমি আবার দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি সিডর, আইলা, মোহাসেন ও আম্পানের মতো ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড় থেকে দেশকে বারবার রক্ষা করেছে। আবার পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে তেমনি পর্যটনের জন্য সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আকর্ষণ করে। এসব বনভূমি বন্যপ্রাণী ও জীবজন্তুর অভয়ারণ্য হিসেবে কাজ করে যা জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বনভূমি ঘরবাড়ি নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরির উপকরণ, শিল্পের কাঁচামাল, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপকরণ, কর্মসংস্থান, নদীভাঙন রোধসহ বহুমুখী উপকারে আসে। সুতরাং বনজ সম্পদ অপরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের পরিবর্তে সংরক্ষণের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং এতে পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে।

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব(Importance of Fisheries Resource Conservation): আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মৎস্য খাত। বাংলাদেশে মৎস্যের মধ্যে রয়েছে শিং, মাগুর, টাকি, শোল, পুটি, চিংড়ি, রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, গ্রাস কার্প, সিলভারকার্প, নাইলোটিকা, ইলিশ, পাবদা, পোয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক উৎসগুলো থেকে মৎস্য সরবরাহ কমে যাওয়ায় মৎস্য চাষের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। এক সময়ে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক জলাধারগুলো থেকে মৎস্য সম্পদ আহরণ করতো কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিঠাপানি ও লবণাক্ত পানিতে বিপুল পরিমাণ মাছের চাষ হওয়ায় আমিষের ঘাটতি পূরণে বড় ধরনের সফলতা পেয়েছে। এছাড়া হাজার হাজার হ্যাচারীর মাধ্যমে লক্ষ কোটি মাছের পোনা উৎপাদন করে সারা দেশে মৎস্য বিপ্লব সাধিত হয়েছে। সেইসাথে বঙ্গোপসাগরের মালিকানা নির্ধারণ হওয়ায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য আহরণের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে যাকে আমরা 'ব্লু ইকোনোমি' (Blue Economy) এর অংশ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এছাড়া ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য চাষের বিকল্প নেই। তাই সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে মৎস্য চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই মৎস্য চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই মৎস্য চাষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎসগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি।

ভূমি সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Land Resource Conservation): আমরা পাঠ ৩. ১ এ জেনেছি যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, দেশের মোট ৩০.৬৫ শতাংশ মধ্য উঁচুভূমি, খুব নিচু ভূমির পরিমাণ মাত্র ৬.৭০ শতাংশ। ভূ-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যতা বাংলাদেশের জন্য প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ। বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য যে বিষয়টি সমস্যার কারণ তা হলো আয়তনের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা। তাই ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমিত ভূমির দ্বারা দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্পকারখানাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমির প্রয়োজন হয়। এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি, জলাভূমি, খোলামাঠ, বিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা তো রয়েছেই। তাই এসব চাহিদা পূরণের জন্য অতিরিক্ত ভূমি প্রয়োজন। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কিছু মানুষ পাহাড়, বনভূমি অবৈধভাবে কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। ফলে তা পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় যে সীমিত ভূমি রয়েছে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব (Importance of Human Resource Development): আমরা পূর্বেই জেনেছি বাংলাদেশ আয়তনের তুলনায় একটি জনবহুল দেশ। বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারলে তা দেশের জন্য কল্যাণকর এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হবে। সকল সম্পদের মধ্যে মানব সম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মানুষও জাতীয় সম্পদ। কোনো দেশের আয় যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল তেমনি মানব উন্নয়ন ছাড়া সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের এই যুগে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকসমূহ জাতীয় উন্নয়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দক্ষ ও কর্মক্ষম এবং কর্মের সাথে সম্পৃক্ত মানুষই মূলত মানব সম্পদ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ।

জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়ে থাকে। জনগণের মাঝে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের নিজের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। মানব সম্পদের উন্নয়ন হলো উন্নয়নের মূল প্যারামিটার। জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো শিক্ষা। সঠিক শিক্ষা কাঠামো এবং যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি মানব সম্পদ উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে অল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ পেশায় প্রশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কারিগরি শিক্ষা প্রয়োজন। এছাড়া ডেমোগ্রাফিক

ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগিয়ে এই বিপুল পরিমাণ কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। যেমন- বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিট্যান্স) আয় করে থাকে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিতে জনগণকে শিক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবি, দক্ষ, আধা দক্ষ, স্বল্পদক্ষ/অদক্ষ জনশক্তি বিদেশে গমন করে থাকে (সারণি-৪.৫.১)।

সারণি-৪.৫.১: শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবি	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ/অদক্ষ
১৯৯০	৬,০০৪	৩৫,৬১৩	২০,৭৯২	৪১,৪০৫
২০০০	১০,৬৬৯	৯৯,৬০৬	২৬,৪৬১	৮৫,৯৫০
২০১০	৩৮৭	৯০,৬২১	১২,৪৬৯	২৮৭,২২৮
২০১৯	১,৯১৪	৩০৪,৯২১	১৪২,৫৩৬	১৯৭,১০২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২০

সারণি ৪.৫.১ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গমনকৃত শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসীদের মধ্যে স্বল্পদক্ষ/অদক্ষের শতকরা হার অধিক এবং পেশাজীবির সংখ্যা সবচেয়ে কম। প্রবাসে যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করবে এবং অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৫.৪৩ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪০.৫১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২০)। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত সামরিক, আধাসামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘের হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় সম্পদের চাহিদা বেশি। ফলে বিদ্যমান সম্পদ দিয়েই চাহিদা পূরণ করতে হয়। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। বাংলাদেশে যেসব সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ভূমি সম্পদ, বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী। জ্বালানি, বিদ্যুৎ, স্থাপনা নির্মাণ, বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি, শিল্পকারখানা প্রভৃতিতে খনিজ সম্পদ ব্যবহার করা হয়। বনজ সম্পদ আসবাবপত্র, নির্মাণ উপকরণ, শিল্পের কাঁচামালসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যেও বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৎস্য সম্পদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে। এসব সম্পদের সাথে অসংখ্য মানুষ সম্পৃক্ত থেকে জীবন-যাপন করে থাকে। এছাড়া যে বিপুল জনগোষ্ঠী রয়েছে তা দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সুফল যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে মানব সম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হবে। সুতরাং আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ উত্তোলন ও ব্যবহার এবং বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর নিশ্চিত করতে পারলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব। এজন্য সকলকে সচেতন হতে হবে এবং সরকারকে বাস্তবভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী দূরদর্শী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. কৃষি বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করুন। (What is meant by agriculture? Discuss the major sector of agricultural system in Bangladesh.)

২. বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (Describe the importance of agriculture in Bangladesh.)

৩. শক্তি সম্পদ কী?। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের বিস্তারিত বর্ণনা দিন। (What is power resource? Elaborately describe the natural gas of Bangladesh.)

৪. বাংলাদেশের শক্তির উৎসগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (State briefly the sources of power in Bangladesh.)

৫. খনিজ সম্পদ কাকে বলে? বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর এবং কঠিন শিলা পাওয়া যায়? (What is mineral resource? Where is limestone and hard rock found in Bangladesh?)

৬. আদমশুমারী কী? বাংলাদেশে জনসংখ্যার কাঠামো বর্ণনা করুন। (What is population census? Narrate the population structure of Bangladesh.)

৭. জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষণ করুন? (Analysis the population growth trend of Bangladesh in the context of Demographic Transition Model.)

৮. “টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করা আবশ্যক”- ব্যাখ্যা করুন। (“Resource conservation is required for sustainable development”- Explain it.)